‘বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১’

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে

পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

বিমূর্ত ধারণা (Abstract)

গবেষক

বিমল চন্দ্র বর্মণ

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫

রেজি. নং: **A00HI1200215**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

‘বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১’

ভূমিকা:

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার অন্তরালে কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী ইতিহাস নির্মাণ যার পদ্ধতিগত ইতিহাস মূলত সাধারণ মানুষ ও তার অভিজ্ঞতাকে শ্রেণির ধারণার মধ্য দিয়ে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষকে ইতিহাসে সংযুক্তকরণ একপ্রকার ইতিহাসকে অনেকটা তলিয়ে দেখতে সাহায্য করে। ফলত বস্তুবাদী ইতিহাসকে প্রকল্পের বিষয় করে কোন স্থানের নিরিখে উপস্থাপনা করা হয় তাহলে স্থানের বিশিষ্টতা ও তার অতীত ঘটনার উপস্থিতিকে নতুন করে বুঝতে সাহায্য করে। অর্থাৎ ঘটনার আবির্ভাব ও উপস্থাপন আবার কীভাবে রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠে তার গুরুত্ব প্রকাশ করতে সাহায্য করে। আমাদের আলোচ্য প্রকল্পটি শ্রেণিকে বিষয় করে স্থান ও তার অতীত ইতিহাস পুনঃমূল্যায়নে প্রয়াসী হবে। ঘটনার মধ্য দিয়ে যেমন স্থানের স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করা সহজ হয় তেমনি উক্ত স্থানের সাধারণের না বলা কথা, নতুন কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে সামনে আনতে সাহায্য করে। আখ্যানের (Narrative) এই রূপান্তর একদিকে ঘটনার গুরুত্বকে অন্যদিকে এর শূন্যস্থান পূরনের পূরক হিসাবে বামেদের উপস্থিতি এই দুইয়ের পারস্পরিকতা স্থান ও ঘটনাকে নতুন মাত্রা দেয়।

বঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্ব হিসাবে তেভাগা আন্দোলনের কথা বলতে হয়। আর যদি আন্দোলনের স্থান হিসাবে জলপাইগুড়ি, রংপুর এবং দিনাজপুরের তথা উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ জড়িয়ে থাকে তাহলে রাজবংশী, স্থানীয় মুসলিম ও কিছু সাঁওতাল, ওঁরাওদের দেখতে পাওয়া যায় যারা আন্দোলনের এবং স্থানের মৌলিকতা নির্মাণ করে। এই দুয়ের সম্পর্ককে ‘শ্রেণির ধারণা’য়

এমনভাবে সামনে নিয়ে আসে যেন মুসলিম এবং সাঁওতাল ওঁরাওদের স্বতন্ত্রতাকে অস্পষ্ট করে স্থানের গুরুত্বকে সার্বজনীন (Universal) করে তোলে। স্থানের বৈচিত্র্যতার পরিবর্তে সামগ্রিক অর্থে 'কৃষক সম্প্রদায়' দিয়ে সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। 'কমরেড' সূচক সম্বোধন এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যেন প্রচলিত সমাজের মধ্যে একটা আলাদা গোলার্ধ তৈরি হয় যেখানে 'আমরা সকলে একসঙ্গে রয়েছি' এমন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে রাজবংশীর অবস্থান কীভাবে সংযুক্ত হয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়া অন্বেষণ করবে আলোচ্য গবেষণা সন্ধর্ভটি।

জাতিসম্ভূত সমাজে শ্রেণি সংযুক্তের প্রসঙ্গটি একপ্রকার ১৯৪৬ সাল থেকে বঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গে প্রকট হয়। সেকারণে সন্দর্ভের আলোচ্য সময়সীমা তেভাগার পর্ব থেকে বিবেচিত হবে। এই সংযুক্তকরণের সঙ্গে জুরে আছে বঙ্গের প্রথমদিককার বাম নেতৃত্বের আত্মত্যাগ ও নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন। সেদিক থেকে দেখলে 'জাতি' ও 'শ্রেণির' উভয়ের এক দীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ করা যায়। ভারতীয় সমাজ ধর্মের আদলে সৃষ্ট হলেও সেই ইতিহাসে কীভাবে শ্রেণিচেতনা বৃদ্ধি করা যায় এজন্য বামপন্থীদের একটা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেই সংগ্রাম হলেও আমরা মূলত বঙ্গের নিরিখে তা সীমাবদ্ধ রাখব। বৃহত্তর বঙ্গের কমিউনিস্ট ভাবধারার সঙ্গে রাজবংশীদের বোঝাপড়াকে তেভাগার আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) দিয়ে অতি সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণ অবিভক্ত বঙ্গের রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুর ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এবং আন্দোলনের জন্মস্থান। আর সেই স্থানীয় ইতিহাস রচনায় রাজবংশীদের ভূমিকাকে এতাবৎ হওয়া গবেষণায় বিশেষ প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে যুক্ত হওয়ার সুযোগ যেমন হয়েছিল তেমনি সন্দর্ভের পরিসীমা হিসাবে উক্ত স্থান

বিবেচিত হয়েছে। সম্প্রতি 'উত্তরবঙ্গ' নামে যে অঞ্চলটি সমধিক পরিচিত তার প্রেক্ষাপটে সন্দর্ভটি প্রণয়িত হবে।

পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা:

উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকেই ভারতের বিভিন্ন জেলার সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব্রিটিশ আধিকারিকরা। সেই লেখনীতে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ আধিকারিকদের এই ধরনের উদ্যোগের আবডালে ছিল প্রশাসন পরিচালনার তাগিদ ও সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্ন। সে কারণে প্রত্যেক জেলার জনবিন্যাস ভালোভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং জেলা শাসক ও অনান্য আধিকারিকদের সেই দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহ দেন। শুধু তাই নয়, জনবিন্যাসের সঙ্গে জনতত্ত্বের ধারণা দিতে থাকলে স্থানীয় সমাজে একধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তখন থেকেই জাতির আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলা চলে। বিশ শতকে তথাকথিত ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণীয় মানুষদের জাত্যগ্রসরণ (Caste Mobility) ধারার সুত্রপাত ঘটতে দেখা যায় উক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। যে সকল ব্রিটিশ আধিকারিকের লেখনীতে রাজবংশী বিষয়টি জায়গা করে নিয়েছিল এমন কয়েকজন শাসক পন্ডিতবর্গের মধ্যে ড. বুকানন হ্যামিল্টনের (Buchanan Hamilton) নাম করতে হয়। তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলি সঙ্ঘবদ্ধ করে মন্টগোমারী মার্টিন পরবর্তীতে প্রকাশ করেন (১৮৩৮) '*The History, Antiquity, Topography and Statistic of Eastern India'* নাম দিয়ে। এর পরবর্তীতে ডাব্লু ডাব্লু হান্টার(W. W. Hunter), হার্বাট রিজলী (H. H. Risley) কিংবা ও'মালি (L.S. O'Malley) নাম উল্লেখ করা যায়। তবে ব্রিটিশ শাসন বিস্তারের সঙ্গে বুকানন-সৃষ্ট জ্ঞানচর্চার ধারা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন ডাব্লু. ডাব্লু. হান্টার

লিখেছেন: 'My materials are chiefly taken from Dr. Buchanon Hamilton's Ms Account 13 of Rangpur, Mr. B.H. Hodgson's Essay on the Koch, Bodo, Dhimal Tribes (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1849 Part-ii), and Colonel Daittan's, Descriptive and Ethnology of Bengal' (Calcutta 1872)'।

বিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যেসকল ভারতীয় জাতি বিষয়টি লেখনীর প্রতিপাদ্য করেছিল তারাও উপনিবেশিক ধারা অনুসরণ করে জাত ব্যবস্থার নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের *'Hindu Caste and Sects, An exposition of the origin of the Hindu Caste system and the bearing of the sects towards each other and towards others religious system'* গ্রন্থটি ১৮৯৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের *'Origin and Growth of Caste in India'* প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ১৯৫১ সালে প্রকাশ করেন *'Kirata Jana Kriti'*। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *'বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)'* প্রকাশ পেয়েছে ১৯৬৩ সালে। নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের *'Origin and Growth of Caste in India, Vol-II, Castes in Bengal'* প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। গ্রন্থগুলি মূলত বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বিচার করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার তাঁর গ্রন্থে রাজবংশীদের অবস্থান দেখাতে গিয়ে তিনি নিন্দাসূচক ভাবনার প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে জাত ব্যবস্থার মধ্যে আর্য ও অনার্য বির্তকের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন,একটু ভিন্নভাবে। তিনি বিষয়টি দেখেছেন 'আর্য ও অনার্য শব্দদুটি দুটি ধর্মের বিভিন্নতার সূচক যা দলাদলির সংজ্ঞামাত্র'। উক্ত গ্রন্থগুলি অনেকটা বঙ্গে

নিরিখে রচিত হয়। তা সত্ত্বেও এই নতুন লেখনীতে সেই অর্থে নিম্নবর্ণীয় মানুষের অবস্থান ফুটে উঠেনি।

১৯৯০র দশক থেকে উক্ত ধারার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় ইতিহাসে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস রচনা গুরুত্ব পেয়েছে। সেই উদ্যোগে রাজবংশীদের উপর কয়েকটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মূলত একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে থেকে রাজবংশী জাতি আন্দোলন নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ হয়। তার মধ্যে স্বরাজ বসুর *'Dynamics of a caste movement: The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947'*. গ্রন্থটি রচিত হয় ২০০৩ সালে। বসু মূলত রাজবংশীদের পরিচিতি, জাতি চেতনা এবং ক্ষত্রিয়করণের রাজনীতির জায়গাটিকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। রাজবংশী জাতির জনক হিসাবে পঞ্চানন সরকারের (তিনি পঞ্চানন বর্মা নামে সমধিক পরিচিত) 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠার সময় কাল থেকে (১৯১০) দেশভাগ পর্বের সময়সীমার মধ্যে রাজবংশীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচনা রেখেছেন। সেই জীবনচক্রে পঞ্চাননের 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রভাব এবং কিছুটা সমিতির ব্যর্থতার ইতিহাস তিনি লেখনীতে নিয়ে এসেছেন। একই সঙ্গে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় যা সমিতি গড়ে তোলার পশ্চাতে পঞ্চাননের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান বোঝতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে জাতি আন্দোলন গড়ে তোলার আবডালে বর্মার পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ২০০৪ সালে রূপ কুমার বর্মণের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ *'জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্বঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজবংশী–ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা'* প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য হল ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পটভূমি গড়ে ওঠার

পশ্চাতে যে প্রশ্নটি সামনে আসতে দেখা যায় তা হল রাজবংশীরা, কোচ জাতি নয়। ব্রিটিশ আদমশুমারির অভিপ্রায় ছিল কোচ ও রাজবংশী একই জাতি সম্ভূত। এই বির্তকটি ধরে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা কোচদের, রাজবংশী জনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তকরণের দিকে নিয়ে যায়। বর্মণ বাবুর এই অনুসিদ্ধান্ত অনেকটা ব্রিটিশ প্রতিবেদন নির্ভর। এর সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন রাজবংশী এলিট সম্প্রদায় জাতি রাজনীতির (Caste Politics) তুলনায় জাতীয় রাজনীতির (National) ক্ষমতার পরিসরকে অনেকটা বড় করে দেখেছেন। যার কারণে একটা সময় দেখা গেল জাতি আন্দোলন থেকে বেড়িয়ে অনেকে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেন।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ রাজবংশী জাতি আন্দোলন, রাজবংশীদের আলাদা রাজ্যের দাবি এবং তাদের রীতিনীতি কিংবা কীভাবে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত সমাজের অঙ্গে পরিণত হয়েছে তার আলোচনার হলেও শ্রেণির নিরিখে রাজবংশীদের নিয়ে কোন গবেষণা রচনা হয়নি। উত্তরবঙ্গের শ্রমের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজবংশীদের অবস্থান নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ নেই বললে চলে। তার মধ্যে এক দুজন গবেষকের রচনাতে কিছুটা বাম আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে। তার প্রসঙ্গ অনেকটা তেভাগার উপর। তেভাগা আলোচনার বিষয় হলেও তাতে রাজবংশীদের কথা আলোচনাই উঠে আসেনি। অথচ উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ এবং তার অবদানের কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু লেখনীতে তাদের কথা একপ্রকার নেই বললে চলে। শ্রেণির নিরিখে যে সকল গবেষণা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে রঞ্জিত দাসগুপ্তের নাম উল্লেখ করা হয়। তিনি বাম দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে জলপাইগুড়ির ইতিহাস লিখেছেন। জেলা হিসাবে জলপাইগুড়ির উৎপত্তির (১৮৬৯) সময়কাল থেকে দেশভাগ পর্যন্ত তার গবেষণার পরিধি। মুলত বোদা, পাটগ্রাম ও পচাগড়

এই তিনটি অঞ্চল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন। এই গবেষণা গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল জলপাইগুড়ির সামাজিক কাঠামোর স্বতন্ত্রতাকে তুলে ধরা। এই মৌলিক ধারা সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাবধারাকে যুক্ত করে পরিবর্তনের জায়গাটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই নতুন ভাবধারা অনেকটা শাসকের হাত ধরে বিশেষত চাবাগিচা এবং রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ তৈরি হয়েছিল। এতেই স্থানীয় জীবনধারাতে পরিবর্তনের দিকগুলো প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে পুঁজির বিকাশ এবং শ্রমজীবি মানুষের আবির্ভাব জলপাইগুড়িতে বাম-রাজনীতির পরিসর সৃষ্ট হতে সাহায্য করে। এই সূত্র ধরে তেভাগা আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেছেন। যা জাতি রাজনীতির উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল তার আভাস ফুটিয়ে তুলেছেন। সুভজ্যোতি রায় ব্রিটিশ শাসন কাঠামোয় কীভাবে জলপাইগুড়ির সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে বাম আন্দোলনের সাংগঠনিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কার্তিক চন্দ্র সূত্রধরের গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে জমি ও জমি সম্পর্কে বিবর্তন এবং এর মধ্য দিয়ে যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে তা তিনি জলপাইগুড়ির জেলার নিরিখে তুলে ধরেছেন। উপরিউক্ত রচনাসমূহ রাজবংশীদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা রাখলেও বাম-রাজনীতিতে রাজবংশীদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে একপ্রকার নীরব থেকে গেছে। সেই শূন্যস্থানের পূরক বলা যেতে পারে আমাদের আলোচ্য সন্দর্ভটি। সেই সূত্রেই আমরা আলোচ্য প্রকল্পটির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রথম জিজ্ঞাসা হিসাবে নিচের প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে।

গবেষণার সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ -

১। উত্তরবঙ্গের বাম-রাজনীতির উৎপত্তির জায়গাটি কীভাবে রাজবংশী অবস্থানের সঙ্গে এক করে দেখা যায় ?

২। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে কীভাবে রাম-রাজনীতি নির্ধারণ করে ?

৩। রাজবংশী মুক্তি প্রশ্নটি কীভাবে বামপন্থী নীতিতে জায়গা পেয়েছিল ?

৪। বাম-রাজনীতি কীভাবে রাজবংশী সমাজকে জমি বন্টন নীতির দ্বারা প্রভাবিত করে ?

৫। জাতি ও শ্রেণির সহবস্থান কীভাবে আলাদা রাজ্যের দাবিকে তুলে আনে ?

গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি রূপায়ণ হেতু প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেই উপাদানের জায়গাটি প্রধানত কোন অভিজ্ঞতা, ঘটনা বা অভ্যাসের জায়গা থেকে উপলব্দ হয়। তথাকথিত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে সরকারি মহাফেজখানার উপর নির্ভরশীলতা তথ্য অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে আমাদেরকে সমূহ গুরুত্ব আরোপ করতে আগ্রহশীল করে তুলেছে। যা ইতিহাসের সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা, লিফলেট, পত্রপত্রিকা, মৌখিক ইতিহাস (Oral Narative) এবং ব্যক্তিগত ডাইরি ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা অনেকটা মহাফেজখানার সীমাবদ্ধতার শূন্যস্থান পূরণ করতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ আমাদের গবেষণা প্রকল্পটি সরকারি পরিভাষা পূনঃমূল্যায়নের পাশাপাশি স্থানীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলো যেমন তাদের রচিত গল্প, গান, কাব্য, কথা, ছিল্কা, নাটক, কবিতা এবং প্রবন্ধের ব্যাখ্যা নতুন করে Existing Literature কে বদল না করলেও নতুন করে ভাবাতে সাহায্য করবে। এতাবৎ প্রকাশিত হওয়া গ্রন্থের (Secondary Materials) বিচার্যতাকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের বাম-আন্দোলনের জোয়ারে রাজবংশীদের অবস্থানকে দেখাতে সচেষ্ট হবে। আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা নিলেও, রাজবংশীরা বামপন্থী রাজনীতিতে কীভাবে মূল্যায়িত হয়েছে তার যথোপযুক্ত

আলোচনা রেখেছে। সেকারণে উত্তরবঙ্গের বাম আন্দোলনের প্রসরতা দিকে না অগ্রসর হয়ে বরং উত্তরবঙ্গ নিয়ে তাদের যে পরিভাষা প্রকাশ পেয়েছে সে দিকে লক্ষ রেখে সন্দর্ভটি রচিত হবে। যে বোঝাপড়া আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে জাতি রাজনীতির প্রসঙ্গটিকে। সেকারণে সন্দর্ভটি জাতি থেকে শ্রেণি এবং শ্রেণি জায়গা থেকে জাতির মৌলিকতার প্রশ্নটির অনুসন্ধান করবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বঙ্গের বামপন্থীদের কার্যকলাপ তাদের দৈনন্দিন অভ্যাস পাল্টানোর আভাস দিয়ে সমাজকে বিশ্লেষণের একটা ঝোঁক বরাবরেই ছিল। তাঁদের সেই অবস্থান কতটা স্থানীয় সমাজ পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রাথমিক অনুসন্ধান আমাদের আলোচ্য প্রকল্পটি রচনায় উদ্যোগ নিতে সাহায্য করে। ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে একপ্রকার কোন ঘটনা বা অভ্যাস কিংবা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সূত্রায়িত হয়। সেই নিরিখে বাম কমরেডদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ইতিহাসে উপজীব্য। এই Commonality উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের একটি যোগসূত্র যা স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলে কি প্রচলিত সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে অন্যরকম হয়ে যায়? সামাজিক সংগঠনগুলো কি ভেঙ্গে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই জিজ্ঞাসাগুলো প্রাথমিকভাবে আমাদের উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

অধ্যায় বিভাজন:

আলোচ্য গবেষণায় রাজবংশীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হবে। যা সাহায্য করবে রাজবংশীদের নিজস্ব অবস্থানকে তুলে ধরতে। অন্যথায় এই সংস্কৃতিতে কীভাবে বাম-রাজনীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। যা নিয়ে এর অধ্যায়ে আলোচনা রাখা হবে। উভয়ের সংযুক্তি ও বিভাজনের জটিলতার জায়গাগুলো নিয়ে শেষের অধ্যায়ে আলোচনা রাখা হবে।